ডাক্তার আছে, হাসপাতালও নেই সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ

• হাবিবুর রেজা

ঘটনা এই ১৮ আগস্টের– সাজ সাজ রব পড়েছে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ধোপদুরস্ত পোশাক পরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন হাসপাতালের প্রবেশমুখে ডাক্তার আর টেকনিশিয়ান থেকে নার্সরা সবাই। এমনকি হাসপাতালের কন্ট্রাকটররাও ছুটে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে। মন্ত্রী নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছিলেন এই দৃশ্য দেখে– নিশ্চয়ই তার সারা শরীরে তখন আপনাআপনি জেগে উঠেছিল রাজা-বাদশার অনুভূতি। দীপ্ত পদক্ষেপে কোনো দিকে না তাকিয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন সারিবদ্ধ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্য দিয়ে– যেমনটি দেখা যায় বাংলা সিনেমাতে– রাজা মহাশয় এগিয়ে চলেন মসনদের দিকে, আর তখন বাজতে থাকে আগমনী বাদ্য...

রাজা আসে, তাই বাদ্য বাজে; মন্ত্রী আসে, তাই স্বাভাবিক কাজকর্ম বাদ দিয়ে হাজির থাকতে হয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। তবে ওই রোগীদের ভাগ্য একদিক থেকে ভালো, সেদিন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে তাদেরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে বেড থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। যদিও কয়েক ঘণ্টা তাদের দেখাশোনা করার মতো কেউ ছিল না, ডাক্তার-নার্স সবাই ব্যস্ত ছিলেন মন্ত্রীকে নিয়ে, বন্ধ ছিল হাসপাতালের স্বাভাবিক সব কাজ। তবে ডেইলি স্টার পরদিন তাদের প্রথম পাতায় ছেপেছে একটি মর্মস্পর্শী ছবি– এক্সরে করার পর পা ভেঙে যাওয়া বৃদ্ধা আসিয়া বেগম সন্তানের কোলে চড়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসছেন। সবাই তখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে মন্ত্রীর জন্য, কে তাকে দেবে ট্রলি কিংবা হুইল চেয়ার? 'ভাত জোটে না, আবার খাট্টার জন্যে কান্দে!' এক্সরে করতে পেরেছে এই তো অনেক!

সরকারি হাসপাতালগুলোর চিকিৎসাসেবার এটি একটি নেহাত-ই ছোট উদাহরণ। নিশ্চয়ই তা 'বড়' কোনো 'ত্রুটি' নয়। মন্ত্রীকে তো আর দৈনিক পাওয়া যায় না! তা ছাড়া এ রকম হাসপাতালে তাও ডাক্তার পাওয়া যায়– যা অনেক বড় ব্যাপার। কিন্তু বিভিন্ন থানা-উপজেলার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে তো ডাক্তারই থাকে না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসকরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করলে অনেক রোগীকেই শহরের বড় হাসপাতালগুলোতে আর আসতে হতো না। কিন্তু সরকারি চাকরির অংশ হিসেবে পোস্টিং পেলেও ডাক্তারদের লক্ষ্যই থাকে শহরে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে থাকা। অতএব তারা বেতন তোলার সময় ছাড়া সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাদের বরং দেখা যায় শহরের কোনো প্রাইভেট ক্লিনিক বা হাসপাতালে কাজ করতে, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে। দেখা যায় 'স্বাস্থ্য রাজনীতি' করতে– ওটা করা না গেলে তো আবার বদলির তদবিরে কাজ হবে না।

তবে অন্তত একটি কারণে প্রশংসা প্রাপ্য সরকারি হাসপাতাল আর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর– সেখানে অন্তত মৃত্যুর পর রোগীর লাশ আটকে রাখা হয় না, শোকসন্তপ্ত পরিবারকে জিম্মি করা হয় না। লাশ আটকে রেখে এবার ইউনাইটেড হাসপাতাল যে ক্ষত তৈরি করল, অনেকদিন তা আমাদের বয়ে বেড়াতে হবে। মরে যাওয়ার পরও বিলের পাল্লা ভারী করার জন্য রোগীকে সিপিইউতে রেখে দেয়া হয়, আত্মীয়-স্বজনদের বলা হয় অমুক-তমুক পরীক্ষা করতে হবে। কোনো কোনো সুখ্যাত প্রাইভেট হাসপাতাল সম্পর্কে এরকম অভিযোগ মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ওইসব অভিযোগ যে নেহাত-ই অপপ্রচার নয়, আমাদের এখন তা-ই মনে হয়। মৃত রোগীর লাশ আটকে রাখার পর ব্যাপক সমালোচনার মুখে শর্তসাপেক্ষে ব্যবসায়ী মো. আসলামের লাশ ফিরিয়ে দিয়েছে হাসপাতালটি। ইউনাইটেড হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল ৩ জুলাই। শোনা যাচ্ছে, নিজেদের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে আত্মীয়-স্বজন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চিকিৎসক আশার বাণী দিয়ে রেখে দেন তাকে। ওই আশা শেষ পর্যন্ত তাদের নিয়ে গেছে দুঃসহ এক পরিস্থিতির দিকে। ১২ লাখ টাকা পরিশোধ করার পর তারা অসমর্থ হয়ে পড়েছেন। আগামী ৫ মাসের মধ্যে তাদের পরিশোধ করতে হবে আরো ১৫ লাখ টাকা। এ ঘটনার পর দেখা দিয়েছে মারাত্মক বিভিন্ন আশঙ্কা– যেমন, প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে রোগীর চিকিৎসা নেয়া ভবিষ্যতে আরো কঠিন হয়ে উঠবে, কেননা এখন সেখানে রোগী যাওয়ার পর প্রথমেই খতিয়ে দেখা হবে, রোগীর চিকিৎসা করার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য আছে কিনা, রোগী অগ্রিম ব্যয় দিতে পারবে কি না। হয়তো রোগীর কাছে দাবি করা হবে, চিকিৎসা করতে হলে যাবতীয় সম্ভাব্য ব্যয় চুকিয়ে দেয়া হোক।

> একটি দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে গোটা স্বাস্থ্য খাতে। কমিউনিটি কমপ্লেক্স থেকে রোগীদের পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে রোগীকে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে জেনারেল হাসপাতালগুলোতে, সেখান থেকে রোগীদের চালান করা হচ্ছে প্রাইভেট হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে। ডাক্তার, ভুয়া ডাক্তার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সবার ওপরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়– সব পর্যায়ের দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজন মিলেমিশে এ চক্র গড়ে তুলেছেন

মৃত রোগীর লাশ আটকে রাখার এ ঘটনা ঘটেছে ঢাকায়। এর পরপরই ২০ আগস্ট খুলনায় ঘটেছে আরেকটি ঘটনা। ম্যাট্রিক পাস করেই বছরের পর বছর এমবিবিএস ডাক্তার হিসেবে ব্যবসা করতে থাকা ৭ জন ডাক্তারকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-৬-এর সদস্যরা। তাৎক্ষণিকভাবেই তাদের বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দেয়া হয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত থেকে। এদের একজন পঞ্চানন মহলী বসতেন 'খুলনা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে', ফেরদাউস রহমান বসতেন 'মীম নার্সিং হোমে', 'সেবা ক্লিনিকে' বসতেন অনুপ মিত্র, 'শাহাবুদ্দিন মেমোরিয়াল ডেন্টাল ক্লিনিকে' বসতেন গাউসুল আজম, 'এএন ডেন্টাল কেয়ারে' ছিলেন সৌমেন ডাক্তার, 'রংধনু ক্লিনিকে' ছিলেন ইব্রাহিম বাহাদুর। আরেকজন কাঞ্জিলাল– তিনি করতেন প্রাইভেট প্র্যাকটিস। এরকম আড়াইশ-র মতো ভুয়া এমবিবিএস ডাক্তার নাকি চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন সারাদেশে!

সব মিলিয়ে একটি দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে গোটা স্বাস্থ্য খাতে। কমিউনিটি কমপ্লেক্স থেকে রোগীদের পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে রোগীকে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে জেনারেল হাসপাতালগুলোতে, সেখান থেকে রোগীদের চালান করা হচ্ছে প্রাইভেট হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে। ডাক্তার, ভুয়া ডাক্তার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সবার ওপরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়– সব পর্যায়ের দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজন মিলেমিশে এ চক্র গড়ে তুলেছেন। তাদের দাপটে অসহায় ভালো মানুষরা, চিকিৎসাসেবা দিতে আগ্রহী ব্যক্তিরা আর রোগীদের কথা তো লেখাই বাহুল্য। এটি এমন একটি দেশ, যেখানে ভুল চিকিৎসায় কারো অঙ্গহানি হলে, এমনকি মারা গেলেও ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যান দোষী ডাক্তার ও তার সহযোগীরা। বছরখানেক আগে সাভার পৌর এলাকার বাসিন্দা জহুরুল ইসলাম চঞ্চলের গর্ভবতী স্ত্রী সালেহা বেগম লিজা এনাম মেডিক্যাল হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন ভুল চিকিৎসায়। তা নিয়ে বেশ কয়েকদিন উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ওই ভুল চিকিৎসার জন্য এখনো কারো কোনো শাস্তি হয়নি। এরকম ঘটনা অহরহ ঘটছে এ দেশটিতে। কোনো অন্তঃসত্ত্বা নারীই এখন আর প্রত্যাশা করেন না যে, ডাক্তার তাকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রসব করাবেন। অন্তঃসত্ত্বা নারী ও তাদের পরিবার-পরিজন এখন তাই শুরুতেই আত্মসমর্পণ করেন ডাক্তারদের কাছে। বলেন, 'সেই শেষ পর্যন্ত তো সিজারিয়ানই করতে হবে, খালি খালি কষ্ট দিয়ে আর কী হবে, সিজারিয়ানই করুন!' বোধকরি পৃথিবীর আর কোনো দেশের অন্তঃসত্ত্বা নারীদেরই এ রকম অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয় না প্রসব করতে গিয়ে।

দেশে একটি আইন আছে, যার নাম বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) আইন। কিন্তু সেটিও অপূর্ণাঙ্গ, তাতে এমন কোনো বিধান নেই যে ভুল চিকিৎসা যিনি দিচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। চিকিৎসকের চিকিৎসা দেয়ার সনদ বাতিল করতে পারে, এমন আইন-ই নেই বাংলাদেশে! তার ওপর চলছে এমন অনেক ডাক্তারের রাজত্ব, যাদের নাকি চিকিৎসা করারই যোগ্যতা নেই! এ বছরের মে মাসে ঢাকার জয়নুল হক শিকদার ওমেন্স মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক দাবিদার ডাক্তার সফিউল আজম হামলা চালিয়েছিলেন সাংবাদিক শিশির মোড়লের ওপর। কারণ সাংবাদিক শিশির মোড়ল ওই ডাক্তারের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন, কেন তিনি একজন সরকারি চিকিৎসক হওয়ার পরও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ সময়ের চাকরিতে নিয়োজিত হয়েছেন এবং কেন একেক সময় একেক পদবি ব্যবহার করে রোগীদের বিভ্রান্ত করছেন। তথ্য দেয়ার নামে ওই সাংবাদিককে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে সদলবলে চড়াও হয়েছিলেন শিকদার মেডিক্যালের ওই ডাক্তার। ঘটনা এটুকুই– সাংবাদিক শিশির মোড়লকে বিএসএমএমইউ থেকে চিকিৎসা নিতে হয়েছে, কিন্তু ওই ডাক্তারের এ পর্যন্ত কোনো কিছু হয়েছে বলে জানা নেই আমাদের।

স্বাস্থ্য খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি করলে, তার ফলে রোগীদের মৃত্যু হলে কোনো শাস্তির ঘটনা অন্তত বাংলাদেশে বিরল। ২১ বছর পর এই গত জুলাই মাসে রায় হয়েছে বিষাক্ত প্যারাসিটামল উৎপাদনের দায়ে একটি কোম্পানি অ্যাডফ্লেম ফার্মার বিরুদ্ধে করা মামলার। ১৯৯৩ সালে অ্যাডফ্লেম, পলিশেম ও বেঙ্গল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি– এই তিনটি কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়েছিল। দেশে তখন তাদের উৎপাদিত বিষাক্ত ওই প্যারাসিটামল খেয়ে অসংখ্য শিশুর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তারপরও বিষাক্ত প্যারাসিটামল উৎপাদন বন্ধ হয়নি। ২০০৯ সালে নতুন করে একই অভিযোগে মামলা হয়েছে রিড ফার্মার বিরুদ্ধে। ১৯৮০ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে কিডনি অকেজো হয়ে প্রায় ২৭০০ শিশু মারা যাওয়ার পর বিষয়টি ডাক্তারদের নজরে আসে এবং তদন্তে জানা যায় প্যারাসিটামল খেয়ে শিশুরা এভাবে মারা যাচ্ছে। তদন্ত করে দেখা যায়, অভিযুক্ত ওষুধ কোম্পানিগুলো প্যারাসিটামল সিরাপে মেশাচ্ছে টেক্সটাইল পণ্য, রঙ ও সুপার গ্লু জাতীয় পণ্যে ব্যবহৃত বিষাক্ত কেমিক্যাল ডাই ইথালিন গ্লাইকোল। এই বিচারপ্রক্রিয়াকে থামাতে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি বছরের পর বছর অপচেষ্টা চালিয়েছে এবং এখনো তা অব্যাহত আছে। ড্রাগ আদালতের পিপি নাদিম আলী নিয়মিত আদালতে না যাওয়ায় এই বিচারপ্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়েছে। তবে ধন্যবাদ দিতেই হয় এ মামলার বাদী আবুল খায়ের চৌধুরীকে– যিনি মামলার দীর্ঘ দুদশক পেরিয়ে গেলেও হাল ছাড়েননি। ১৯৯৩ সালে তিনি ছিলেন ওষুধ প্রশাসন কর্মকর্তা, এখন তিনি ওষুধ অধিদপ্তরের পরিচালক। গত ২১ বছর ধরে নানা হুমকি ও প্রলোভন সহ্য করেও লেগে আছেন তিনি। এখন পর্যন্ত একটি কোম্পানির বিরুদ্ধে এই মামলা নিষ্পন্ন হয়েছে এবং এ রকম আরো অন্তত পাঁচটি মামলা রয়েছে, যেগুলো কবে নিষ্পন্ন হবে কেউ জানে না। তবে এসব মামলার সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। কারণ ওষুধ প্রশাসন থেকে মামলা হওয়ায় শিশুহত্যার জন্যে যারা দায়ী, তারা অভিযুক্ত হয়েছে ভেজাল ওষুধ প্রস্তুতকারক হিসেবে।

অনেকেই ভাবতে ও বলতে পারেন, আমাদের এই দেশের স্বাস্থ্যসেবা আর কতটুকুইবা উন্নত হতে পারে! কিন্তু কেবল উন্নত দেশ হলেই কি পাওয়া যায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা? যুক্তরাষ্ট্র কিংবা যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত রাষ্ট্র নয়– স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে এগিয়ে আছে যে দেশটি, তার নাম কিউবা। দেশটির বিরুদ্ধে অপপ্রচারের শেষ নেই। আর শুধু অপপ্রচারই বা বলি কেন, দেশটিতে যিনি বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন এবং এই কয়েক বছর আগেও রাষ্ট্রপতি ছিলেন সেই ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে অসংখ্যবার হত্যার চেষ্টা করেছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর দেশ যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৫৮ সালে এই কিউবায় ১০ হাজার অধিবাসীর জন্যে ছিল মাত্র ৯.২ জন ডাক্তার। কিন্তু ১৯৯৯ সালে এসে সেই অনুপাত দাঁড়িয়েছে, ১০ হাজার অধিবাসীর জন্য ৫৮.২ জন ডাক্তারে। কিউবার মানুষের গড় আয়ু ছিল ১৯৫০-৫৫ সালে ৫৯.৫। ২০০০-২০০৫ সালে এসে তা উন্নীত হয়েছে ৭৭.১-এ। বিশ্বব্যাংকের ২০০৭ সালের হিসাবে তা অবশ্য আরো বেশি। বিশ্বব্যাংক জানাচ্ছে, সারা বিশ্বের মানুষের গড় আয়ু যেখানে ৬৮.৭৬ বছর, কিউবার সেখানে ৭৮.২৬ বছর। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষদের একই সময়ের গড় আয়ু হলো ৭৭.৯৯ বছর। কিউবা স্বাস্থ্যসেবায় এগিয়ে গেছে, কেননা তারা আন্তরিকভাবেই মনে করে, মানুষ মানুষের জন্য।

আমাদের দেশে সেই দিন কবে আসবে, যেদিন আমরা হাসপাতাল বা ডাক্তারদের কাছে আত্মীয়-স্বজন ও শিশুদের পাঠানোর পরও ভাবতে পারব, তারা আমাদের কাছেই আছে? ■